নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৬, পৃ : ১২৩ - ১২৮
© ২০০১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গ্রন্থ পর্যালোচনা

মানস চৌধুরী*

গ্রন্থ শিরোনাম : সান্তাল্‌স অব ওয়েস্ট বেঙ্গল : এথনোসাইকোলজি এ্যান্ড পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পিএইচডি গবেষণার সার-সংক্ষেপ)

রচনাকারী : রাজশ্রী বসু, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ [এর পক্ষে শ্রী কমল মিত্র]

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০০

প্রকাশ-ভাষা : ইংরেজী

মাপ ও বাঁধাই : ১৫ ফর্মা, শক্ত কাগজে বাঁধানো

মোড়ানো কাগজের মলাট রূপকার : পি কে এন্টারপ্রাইজ দাম : ৩৫০ ভারতীয় রুপী

বইয়ের গঠন

বইটিতে নয়টি অধ্যায় আছে। প্রথমে ভূমিকা বা ইন্ট্রোডাকশন এবং শেষে বোধগম্যভাবেই উপসংহার বা কনক্লুশন ছাড়াও মাঝে যে সাতটি অধ্যায় আছে তা হচ্ছে : ডিমান্ড ফর অটোনমি এ্যান্ড দ্য ঝাড়খণ্ড ম্যুভমেন্ট; পলিটিক্যাল এলিয়েনেশন; পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন; রোল অব পার্টিজ; প্রবলেম অব লীডারশিপ; এলিট ভার্সেস মাসেস; গর্ভনমেন্টস এটিট্যুড্‌স টুওয়ার্ড দ্য ঝাড়খণ্ড প্রবলেম; দ্য ইমার্জিং সিন্ড্রোম।

নানাভাবে এই বইটিতে প্রচুর সাংখ্যিক তথ্য সংযোজিত আছে। নানাপ্রকার তালিকা, সারণী এবং ছকের মাধ্যমে সেই সকল উপাত্ত যথাসম্ভব দৃষ্টিগ্রাহ্য করেই উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সংগ্রাহক এবং সাংখ্যিক উপাত্ত পিপাসু মানুষজনের জন্য গ্রন্থটি আকর্ষণীয় বটে। এই সাংখ্যিক উপাত্ত সন্নিবেশন নিছক পদ্ধতিমালা বিভ্রাটজনিত কিছু নয়। বরং পরিসংখ্যান শাস্ত্রের যথাসম্ভব প্রগাঢ় বোঝাপাড়া

* শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

থেকেই সেগুলো সন্নিবেশন করা হয়েছে। সেই হিসেবে এটা শাস্ত্রীয় কাজ। গ্রন্থকার-গবেষক ভূমিকা অধ্যায়ে তাঁর কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েও দিয়েছেন। তিনি জানান : লিকার্ট-টাইপ মানদণ্ড তিনি ব্যবহার করেছেন। আর এ ধরনের তালিকা-সারণী করতে গিয়ে তাঁর কনটিনজেন্সি ট্যাবুলার বিশ্লেষণ, সাই-স্কয়ার টেস্ট এবং ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে হয়েছে, সেই সঙ্গে একটা ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারও (পৃ. ৩৮)। প্রতিটি অধ্যায় শেষে সংযোজিত আছে অনেকগুলি টীকা। টীকাগুলিতে প্রয়োজনীয় বই বা লেখাকে হাজির করা আছে। সেই সঙ্গে একেবারে শেষে গ্রন্থপঞ্জী তো বটেই। এই ধরনের সমানুরূপ লেখাপড়ায় উৎসাহী লোকজনের জন্য সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

ধারণা ও কার্যপদ্ধতির পাটাতন

বোঝাই যায়, এরকম সারণী দিয়ে এত জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলা সহজ নয়। ফলে কাঠামোগত সাক্ষাৎকার নেয়াই লেখক-গবেষকের পক্ষে একমাত্র রাস্তা ছিল। তাছাড়া তিনি কোনমতেই এমন কিছু বুঝতে চেষ্টা করেননি যা তাঁর, মানে 'উত্তরদাতা'রা বলেননি। মানে হ'ল : এই গ্রন্থের লেখক বা গবেষক অনুধাবন করতে চেয়েছেন তাই-ই কেবল যা উত্তরদাতাদের উত্তর থেকে প্রতিভাত হয়। এ কারণেও কাঠামোগত সাক্ষাৎকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রন্থকারের পক্ষে। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা বইটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পাঠকেরা টের পাবেনই। তারপরও নিরপেক্ষতার এতটুকু টানাপোড়েন-সম্ভাবনা বইটিতে মুন্সীয়ানার সাথে নস্যাৎ করে দেয়া আছে - এর উপসংহারে। সেখানে বলা আছে : এই গ্রন্থটি যে গবেষণার সারাংশ সেটা পরিচালিত হয়েছে মাত্র ছটি জেলার কিছু সাঁওতাল অধিবাসীদের মাঝে। সেই বিচারে এটি পশ্চিম বাংলার সাঁওতাল মানুষজনের সামান্য একটা অংশকেই ধারণ করে মাত্র। দিব্যি এই ফলাফল বদলে যেতে পারে যদি অন্য গবেষিত-মানুষজনের মাঝে এই গবেষণা সম্পাদিত হয় (পৃ. ২১৬) গ্রন্থকারের ক্রিয়াবাদী (ফাঙ্কশনালিস্ট) জ্ঞান মজুবত ধরনের। এই নিরপেক্ষতা এই বইটির একটা স্মারক। আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার পড়ছে এখানে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও নানা অঞ্চলে নিপীড়িত জাতিসমূহের নানাবিধ আন্দোলন চলমান। এইসব জটিল বিষয়ে কিছু ডিপেন্ডেন্ট এবং কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েব্‌ল দিয়ে একটা গবেষণা কাজ দাঁড় করানো মোটেই সহজ নয়। আরও কঠিন *নিরপেক্ষতা* বজায় রাখা। সেটা এর একটা বড় দাবি।

যে বিষয়ে ধন্দ লাগতে পারে তা হচ্ছে : এথনোসাইকোলজি বলতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে। হয়তো সেটা মনোবিদ্যার ছাত্রী-ছাত্রের জন্য কোন সমস্যাই নয়। অনেক কসরৎ না করেও, গেলে থাকলে, কেউ বুঝতে পারবেন যে

এথনোসাইকোলজি বলতে বোঝানো হয়েছে আসলে *সাইকোলজি অব এথনিক গ্রুপ*, আর সাইকোলজি বলতে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে *চলতি/প্রকাশ্য* মতামত এবং মনোভাব। আর সেটা গবেষক-লেখক অনুধাবন করেছেন কিন্তু কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের উত্তর থেকেই-নিরপেক্ষতার স্বার্থেই। এখানে 'চলতি' কথাটার মানে দাঁড়াচ্ছে গবেষক যে সময়ে গবেষণা ক্ষেত্রে কাজ করছেন সেই সময়কার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে দেয়া উত্তর। আর 'প্রকাশ্য' কথাটার মানে দাঁড়াচ্ছে গবেষকের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সেই সময়ে উত্তরদাতারা যে মতামত-মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই ব্যাপারে আরও একটু স্পষ্ট বোঝা যায় যদি আমরা ১৫টি 'সাইকোলজিক্যাল' নির্দেশক বা ভ্যারিয়েব্‌ল-এর চেহারা খেয়াল করে নিই। সেগুলি হচ্ছে : ১. রাজনীতিতে আগ্রহ, ২. রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ৩. রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি বোধ, ৪. রাজনৈতিক সচেতনতা, ৫. সামাজিক বিযুক্তি, ৬. কোন সংঘের সদস্যপদ, ৭. দল পছন্দনীয়তা, ৮. প্রচার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ, ৯. রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির বোধ, ১০. রাজনৈতিক দলের প্রতি মনোভাব, ১১. ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতি মনোভাব, ১২. ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ব্যাপারে সচেতনতা, ১৩. ইউনিয়ন সরকারের ভূমিকাতে সন্তোষ, ১৪ রাজ্য সরকারের ভূমিকাতে সন্তোষ, ১৫. রাজনৈতিক বিযুক্তি।

এখানে 'আগ্রহ', 'সংযুক্তি বোধ,' 'সচেতনতা,' 'সন্তোষ' ইত্যাদি ব্যাপারকে মনোজাগতিক হিসেবে দেখা হয়েছে – তা বোঝাই যায়। আর আমাদের বক্তব্যও এমন নয় যে, এগুলি মনোজাগতিক নয়! কেবল দুশ্চিন্তার যা একটু তা হচ্ছে : এই ধরনের মনোজাগতিক তথ্যাদি হাজির করে সাঁওতালদের পক্ষে কী এজেন্ডা খাড়া করা হ'ল। অবশ্য নিরপেক্ষ গবেষণা থেকে সেটা আশা করা সমীচিন নয়। রাজনীতি বলতে কী বোঝানো হয়েছে সেটাও এই বিশেষ কিতাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা যেহেতু এর শিরোনাম থেকেই রাজনীতি একেবারে আলোচ্য প্রসঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে রাজনীতি বলতে বোঝানো হয়েছে সংজ্ঞায়িত পরিধিতে রাষ্ট্রের কোন না কোন ক্রিয়াদিতে অংশগ্রহণ। রাজনীতির এহেন পরিসীমিত উপলব্ধি কতকগুলি সুদূরপ্রসারী সংকট বয়ে এনেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে যেমন বোঝা হয়েছে ভোটদান, সমর্থন ইত্যাদি – তেমনি রাজনৈতিক বিযুক্তি বলতে বোঝা হয়েছে এর বিপরীত প্রক্রিয়াসমূহকে। ফলে পাঠকের অবাক লাগতে পারে বিযুক্তির মার্ক্সীয় ধারণা কী কাজে আসলো, এক অনুচ্ছেদে যা গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করেছেন (পৃ. ৮০)। আর কাফকা'র বাক্যটিও! '..... আই ডু নট ইভ্‌ন রীচ টু ইট্‌স বাউন্ডারিজ' (পৃ. ৭৯)। মনে হয় এখানে সীমানার ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। কিন্তু যাই হোক, বইটিতে সম্ভাব্য নানা

চিন্তাসূত্র নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোন ভাবনা-ঘরানার সঙ্গে গ্রন্থকারের বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপাড়া বা সমন্বয়কে হাজির করা হয়নি। সেটাও নিশ্চয়ই এর **নিরপেক্ষ** পঠন-তাগিদ থেকে উৎসারিত। ভূমিকার একেবারে প্রথম পাতা পড়েই সেটা কেউ ঠাহর করতে পারবেন।

শাসকের কণ্ঠস্বর!

আমার ঠিক ধারণা নেই এই ধরনের গ্রন্থ রাষ্ট্রীক বিভিন্ন দপ্তরের কর্ণধারেরা পড়েন, কিনা, ধরা যাক সেনা দপ্তরের। এই বইটি কিন্তু সবচেয়ে খুশী করবে রাষ্ট্রের বিবিধ দপ্তরকে, তাঁদের এই বইটি পড়া দরকার। পড়লে বলতে পারবেন 'এই তো, গবেষণা করেই গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে আলাদা রাজ্য করে দিলেই তেমন কোন সমস্যা মিটে যাচ্ছে না।' কিংবা 'আমাদের পুঁজিবাদ যদি কোন কাজের না হয়, তোমাদের অমুকবাদও কোন ফয়সালা দেয় না, গবেষকরাই বলছেন!' ইত্যাদি। মানে হ'ল রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি এবং সরকার যা চায়, যেভাবে ভাবে, যেভাবে দেখে – সেভাবেই চেয়েছে, দেখেছে এবং ভেবেছে এই কিতাবখানি। ফলে গ্রন্থখানি শাসকের, বা আরও নিশ্চিত করে বললে শাসনব্যবস্থার, কণ্ঠস্বর রপ্ত করে লেখা। ধরা যাক একেবারে প্রথম পাতারই কথা। সেখানে একটি বাক্য আমি উদ্ধৃত করতে চাই: "... দ্য সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস হুইচ আর রেস্পন্সিব্‌ল ফর দ্য গ্রোথ অব ডিভাইসিভ টেন্‌ডেন্‌সিজ এ্যান্ড টেররিস্ট এ্যাক্টিভিটিজ ইন ডিফেরেন্ট পার্টস অব ইন্ডিয়া..." (পৃ. ১)। পরিপূর্ণভাবে শাসকের কণ্ঠস্বর! কারণ আমরা মনে করতে পারি ঠিক এইভাবেই ভারত কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার মুরুব্বীরা প্রচার করে থাকেন, 'অন্য' জাতিসমূহের *রাজনৈতিক তৎপরতার* বেলায়, কেবল ওই 'সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস' টুকু বাদ দিলে। কিন্তু এখানে সেটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাকে খেয়াল রাখতেই হচ্ছে। কারণ এই ফ্যাক্টরগুলিই কিন্তু নির্ধারকের ভূমিকা পালন করছে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, এর ভাবনাসূত্রের পাটাতনে। শাসকের কণ্ঠস্বরকে চিনতে গ্রন্থটির উপসংহারটিও যথাসম্ভব নজরকাড়া। এখানেই বয়ান করা আছে যে সাঁওতালরা (এই গবেষণার মানুষজন) ঠিক সহিংস নয়। নিতান্ত দায়ে না শাসকের কণ্ঠস্বর, বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি, একাধারে প্রভুর (মাস্টার) আর মুরুব্বীর (পেট্রন)। পেট্রনের ভূমিকা আমাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও মহাপ্রভুর কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি উদাহরণ : "... দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য *রেস্পন্ডেন্টস ক্যুড নাট জাজ দেমসেলভ্‌স* প্রপারলি এ্যান্ড কন্ট্রাডিকশন রিমেইন্‌স ইন দেয়ার সেল্‌ফ-এ্যাসেসমেন্ট।" এই অহংকারের শেকড় ঔপনিবেশিক অতীতে প্রোথিত। এমনকি উপনিবেশের দার্শনিক-নৈতিক ভিত্তি দাঁড় করানো হয়েছেও এর

উপর চড়েই – সভ্যকারী প্রকল্প; আর এখানের মানুষজন তাদের ভাল-মন্দ জ্ঞানটাও রাখে না বলেই তো ইয়োরোপ থেকে তারা এখানে এসেছেন... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগের অনুচ্ছেদ অনেক ভেবে চিন্তেই আমি রাজনৈতিক তৎপরতা কথাটিকে কাৎ করে দিয়েছি। সঙ্গে আরও দু'একটি জায়গা। এটিও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। গ্রন্থকারের রাজনীতি-বোধ সবিশেষ ভিন্ন। ক্ষমতার বিন্যাস, টানাপোড়েন, নিপীড়ন এবং নিপীড়ন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি তাঁর রাজনীতি বোধের পাটাতন গড়ে দেয়নি। সেখানে বরং রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে আমরা এই বইয়ে প্রকাশিত রাষ্ট্র এবং সরকার সম্পর্কিত মূল্যবোধগুলি করতে পারি। রাষ্ট্র গ্রন্থকারের বিবেচনায় (পুরুষ-) মানুষের সহযোগিতার মূর্ত প্রকাশ, আর সরকারের প্রয়োজন এ কারণেই যে (পুরুষ-) মানুষ তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঘনিষ্টভাবে বসবাস করতে ভালবাসে (পৃ. ১৮৯)! কিংবা ভারতবর্ষ একটা বহুভাষিক, বহুজাতিক রাষ্ট্র! রাজনীতির উপলব্ধিকে গাঢ়ভাবে তৈরি করে নিতে পারলে এই মূল্যবোধগুলিও যে রাজনৈতিক – তা বোঝা সহজ হয়। তেমনি 'ক্যুড নট জাজ দেমসেল্‌ভ্‌স' বক্তব্যের অহংকারের শ্রেণীভিত্তি-কৌলীণ্যভিত্তিকে শনাক্ত করা যায় – সেও রাজনৈতিক।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করা দরকার হয়ে পড়েছে। এই আলোচনা থেকে এরকম সিদ্ধান্তে আসা আমার প্রতি সুবিচার হবে না যে, আমি বলতে চাচ্ছি: ঝাড়খণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য-অস্তিত্ব তৈরি হলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কিংবা পুঁজিবাদী-সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার মধ্যে দ্বিতীয়টা অধিকতর শ্রেয়। এরকম সরল বক্তব্য দেয়া আমার অভিপ্রায় নয়। এ কথাগুলি তুলছি এ কারণে যে কতকগুলি প্রবল পূর্বানুমান কাজ করছে এই গ্রন্থে। সেই পূর্বানুমানগুলি ঢেকে দিয়েছে ক্ষমতাব্যবস্থাকে উন্মোচন করবার সম্ভাবনা, নিপীড়নকে শনাক্ত করবার তাগিদ, রাষ্ট্রের প্রবল-দাপুটে ভূমিকাবলী ইত্যাদি। রাজ্য সরকার এবং ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে একটা দ্বিবিভাজন বা ডিকোটমি দাঁড় করানো হয়েছে। ভুল না বুঝে থাকলে সেই দ্বিবিভাজনই পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র-এর স্মারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতাকে বিশ্লেষণ না করার কারণে কতগুলি ব্যাপার জিজ্ঞাসাতেই আসেনি। যেমন : কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতের কোন্ রাজনৈতিক দল কোন্ অঞ্চলের লড়াইকে সমর্থন করে এসেছে? সেই বিশেষ পরিস্থিতির রাজনৈতিক তাৎপর্যই বা কী? আর তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের মুখ্য ভূমিকাতে কী মৌলিক তফাৎ ধরা পড়ছে? প্রবল জাতির দাপটই বা কিভাবে খর্ব হচ্ছে? সেটা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনই হোক আর সাম্প্রতিক কামতাপুরী আন্দোলনই

হোক। এই জিজ্ঞাসাগুলির একটা জবাব পুস্তকে থাকতে পারত – সেটা আমার প্রস্তাবনা নয়। কিন্তু এই জিজ্ঞাসাবলী এই গ্রন্থ – রচনার ভাবনাসূত্রে বিবেচ্যই হয়নি।

মাত্রা নাস্তি!

কিতাবখানি তাঁদের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক যাঁরা নিপীড়িত জাতিসমূহের লড়াইয়ের এজেন্ডা, স্পৃহাকে চেনার চেষ্টা করেন; যাঁরা বুঝতে পারেন নিপীড়িত জাতির রাজনৈতিক তৎপরতা মুখ্যত প্রবলকে মোকাবিলা করবার প্রয়াসে নিয়োজিত; যাঁরা প্রবল জাতির, রাষ্ট্রের, ব্যবস্থার প্রাবল্য ও দাপটকে তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু বানানো জরুরী বলে মনে করেন। তারপরও এই গ্রন্থখানি তাঁদের পড়া দরকার এ কারণে যে, প্রবল মূল্যবোধগুলি কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক-বিশেষায়িত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে পুনরুৎপাদিত হয় তা বোঝার জন্য এরকম বই বিশেষ উদাহরণ। আর বইখানি বিপজ্জনক নিপীড়িত জাতির জন্য তো বটেই। কয়েকটি 'শুনতে ভাল শোনায়' গোছের কথা আছে উপসংহারে। যেমন : 'এদের প্রতি রাষ্ট্রের নজর দেয়া দরকার, শিগগীরই।' উদারপন্থী বা লিবারেল শিক্ষাবিদরা সেটা করে থাকেনই, এটা প্রায় 'নর্ম'-এর পর্যায়ে গেছে। নিপীড়িত লিঙ্গের (নারী) দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বইখানিতে কোন আকর স্বপক্ষীয় ভাবনা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। বরং নারী প্রায় অদৃশ্য। 'সেক্স' একটা ভ্যারিয়েব্‌ল বই কিছু নয়, এই কিতাবে।

নিপীড়িত মানুষজন সাধারণভাবে গবেষকদের কেন দু'চক্ষে দেখতে পারেন না – তা অনুমানযোগ্য। নিজের 'নিজ' বা 'আত্মা' বা 'সেল্‌ফ'কে স্থাপন না করে নিম্নবর্গ নিয়ে অধ্যয়ন করার প্রচেষ্টা রাজনৈতিকভাবে সমস্যাজনক অভিযাত্রা। ও পথে যেন প্রবল বর্গের যাত্রা নাস্তি হয়! তবে রাজশ্রী বসুর এই কাজটির একটা বড় গুরুত্ব হচ্ছে এতে ঝাড়গ্রাম আন্দোলনকে আন্দোলনই বলা হয়েছে। আর প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্সের, তাদের প্রকাশনা এজেন্ডার কারণেই, অন্যান্য কাজের দিকে সজাগ মনোযোগ রাখার আগ্রহ আমার বজায় রয়েছে।